একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

Partition through the eyes of a teenager: Shankha Ghosh's trilogy of novels

কিশোরের চোখে দেশভাগ: শঙ্খ ঘোষের ত্রয়ী উপন্যাস

Name of the Author: **Arijit Ghosh**

Affiliation: **Graduated from Ramakrishna Mission Vidyamandir Belur Math College and completed his post-graduation. His Special Paper was Rabindra Sahitya. Currently, he is preparing for research after passing the WBSET exam and is writing research articles in various journals.**

Abstract: The experience Of Partition and its preceding and subsequent conditions through the eyes of an adolescent in the trilogy of novels by Sankha Ghosh. The novel 'Sokalbelar Alo' describes the period before the partition of India. 'Supuriboner Sari' portrays the mental and emotional condition of people in a newly independent but divided country. In 'Shohorpother Dhulo', the writer focuses on the refugee problems after partition and the rise of Leftist Political Movements. At the same time, this trilogy also shows the journey of a boy from adolescence to youth and highlights the development of his mind and personality during this period.

Keywords: Trilogy, Partition, Independence, Refugee Problems, Leftist Political Movements

কিশোরের চোখে দেশভাগ: শঙ্খ ঘোষের ত্রয়ী উপন্যাস

অরিজিৎ ঘোষ

দেশভাগ ও দেশভাগ পরবর্তী উদ্বাস্তু সমস্যাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে অসংখ্য উপন্যাস ও ছোটোগল্প রচিত হয়েছে। শঙ্খ ঘোষের পরিচয় মূলত 'কবি' হিসেবে হলেও দেশভাগকে কেন্দ্র করে তিনি সৃষ্টি করেছেন অনন্য এক ট্রিলজি। 'সকালবেলার আলো', 'সুপরিবনের সারি', 'শহরপথের ধুলো' এই ত্রয়ী উপন্যাসে শঙ্খ ঘোষ নীলু নামের এক কিশোরের চোখ দিয়ে দেশভাগের পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে শুরু করে দেশভাগ পরবর্তী অবস্থার ছবি দেখিয়েছেন। এখন পর্যায়ক্রমে তিনটি উপন্যাস আলোচনা করে দেখা যাক।

'সকালবেলার আলো' উপন্যাসটিসেই সময়ের কথা বলে যখন দুই বাংলা একত্রিত ছিল। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র নীলু বা নীলমাধবের ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠা এবং তার চারপাশটাকে চিনে নেওয়াইএই উপন্যাসের বিষয়। এর পাশাপাশি দেশভাগের পূর্ববর্তী বাংলার ছবিও ধরা পড়েছে এই উপন্যাসে । নীলুও তার অভিন্ন হৃদয় দুই বন্ধু কেশব ও বরুনের নিখাদ বন্ধুত্বের পরিচয় আমরা এখানে পাই। উপন্যাসের শুরু হয়েছে পদ্মা নদীর বাঁধের পাশে ছোট একটা কলোনিতে ।যে কলোনির মধ্যে একসাথে বড় হয়ে উঠেছে নীলু, বরুণ ও কেশব। তাদের স্কুলের নানা কাণ্ডকারখানা ভোরে নদীর ধারে বেড়াতে যাওয়া বা কেশবের বাড়িতে বাসুদির সঙ্গে গল্প করার পাশাপাশি নীলুর ছোট মামার গাওয়া রবীন্দ্রনাথের গান 'যে ছিল আমার স্বপনচারিণী'র উল্লেখ আলাদাভাবে করতেই হয়। মেঘের মাঝে নীলুর রবীন্দ্রনাথের মুখ খুঁজে পাওয়া বা নিজেকে কখনো কর্ণ , কখনো অর্জুন বলে মনে করা আসলে নীলুরকল্পনাপ্রবণ মনেরই সাক্ষ্য বহন করে । এই উপন্যাসের মধ্যে স্বাধীনতার পূর্বের কিছু টুকরো ছবি তুলে ধরেছেন শঙ্খ ঘোষ। যেমন পদ্মা পাড়ে ভিখিরিকে দেখে বরুন বলেছে- 'লোকটাসি. আই. ডি'[১]। পুরো কথাটার মানে তারা জানে না , কিন্তু বোঝে সি.আই.ডিরা লুকিয়ে খবর দেয় এরা আসলে ব্রিটিশদের চর । স্বাধীনতার পূর্বে 'বন্দেমাতরম' বলা ব্রিটিশদের কাছে সাংঘাতিক অপরাধ বলেই গণ্য হতো , তা এই কিশোরেরাও জানে। কেশব বলেছে- 'আর বন্দেমাতরম? জানিস না, অমনি পুলিশের মাথা গরম হয়ে যায় ?'[২] উপন্যাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকের ছবি ধরা পড়েছে, যে সময় সমগ্র বাংলা জাপানি বোমার আতঙ্কে ভুগছিল । বরুণ বলেছে- '...হয়তো জাপানি স্পাই লুকিয়ে আছে কোথাও। ধর ওই ব্রিজটা ভেঙে দিল । তাহলেই তো সব্বনাশ। সেইজন্যে দেখিস না, ব্রিজে আজকাল উঠতে দেয় না । মিলিটারি ঘিরে রাখে সবসময়ে । যুদ্ধ কী জিনিস বাবা!'[৩] যুদ্ধের ভয়াবহতা কিশোর মনেও গভীর ছাপ ফেলেছে। এই উপন্যাসে বারবার উঠে এসেছে কিশোর নীলুর আত্মউপলব্ধি। যে নীলু বড় হতে চায়নি, কিশোর হয়েই থাকতে চেয়েছে- 'বড়ো হবে? আরো বড়ো? ঠিক তখনই নীলুর মনে হল যে আর বড়ো হওয়া ভালো নয়। বড়ো হলে বাবাদের মতো দশটার সময়ে কাজে বেরুতে হবে। সেই একটা ভয়। আরও ভয় আছে।... সেটাও বেশি ভয়ের। তাই বড়ো হওয়া ভালো নয়। আর তাছাড়া, ধরো বড়ো হলে যদি বা সুদিনা থাকে পাশে, তাহলে আর কী লাভ হলো বড়ো হয়ে।'[৪] কিন্তু নীলুর আশা পূর্ণ হয়নি। জ্বরে অসুস্থ হয়ে

কেশবের মৃত্যু হয়েছে, বাসুদি চলে গেছে শ্বশুরবাড়ি, বরুনের বাবার বদলি হওয়াতে বরুনের সঙ্গও আর পায়নি নীলু। নীলুকে একা একাই বড়ো হতে হয়েছে। উপন্যাসের শেষ হয়েছে নীলুর আত্মউপলব্ধিতে –'কেশব চলে গেছে। বরুনও চলে গেল। হয়তো একদিন যুদ্ধও থেমে যাবে। তখন নীলু ওই ব্রিজের ওপর দিয়ে চলে যেতে পারবে ওপারের দিকে। কিন্তু তখন কেশব থাকবে না, বরুন থাকবে না। যেতে হবে একলা একেবারে একা![৫] এই আত্মউপলব্ধিই পরবর্তীকালে নীলুর চলার পথের সম্বল হয়ে উঠেছে।

'সুপুরিবনের সারি' উপন্যাস সেইসময়ের গল্প বলে যখন সদ্য দেশভাগ হয়েছে। সেই অবস্থায় একজন কিশোর তার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে কীভাবে অনেকে ছেড়ে আসতে চাইছে তাদের চিরদিনের দেশ। আর সেই সঙ্গে পিছনে পড়ে থাকছে হারিয়ে যাওয়া কত প্রিয়জন, কত প্রিয় ছবি। তখন স্বাধীনতা এসেছে সবে, আর দুটুকরো হয়ে গেছে দেশ, সেইসময়ে একবার তাদের গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছে নীলু। একই গ্রাম তার ঠাকুরদা আর দাদামশায়ের। কিন্তু বহুদিন হলো ঠাকুরদা নেই, ছোটোবেলা থেকে মামাবাড়িতেই তারা উঠেছে বেশি, বাড়ি বলতে তাই নীলুরা বোঝে মামাবাড়ি। কিন্তু অন্যবারের থেকে এবারের যাওয়া আলাদা ঠেকে নীলুর কাছে– 'যাবে না কেউ এবার, কেননা দেশ নাকি এবার ভাগ হয়ে গেছে । নীলুদের গ্রামটা নাকি এখন অন্য একটা দেশ । ভারি আজব কথা। এখন নাকি তাই ভিন্ন কোথাও থাকতে হবে তাদের । কোথায়? তাকেও ঠিক জানে না এখনও ।...বড় মামার কথা শুনে বুঝে নিয়েছে নীলু এবার তারা দেশে যাচ্ছে , আর কোনোদিন দেশে না যাবার জন্য ।'[৬] দেশভাগের বিভীষিকা কিভাবে ছড়িয়ে পড়েছে মানুষের মনে তা দেখান শঙ্খ ঘোষ । নীলুর মামার বাড়িতে দুর্গাপূজার সে জৌলুস এবছর নেই। আত্মীয়-স্বজনেরাও বেশিরভাগ অনুপস্থিত, কোনরকমে নমোনমো করে পুজো হচ্ছে। দাদুর সঙ্গে বাজার করতে গিয়ে নীলু দেখে সর্বত্র শুধু দেশভাগের আলোচনা আর দেশত্যাগের প্রসঙ্গ । আসলে যাবার কোন জায়গা না থাকলেও যাওয়া দরকার বুঝে গেছে ওপার বাংলার হিন্দুরা । নীলু অতীত আর বর্তমানে যাতায়াত করে স্মৃতির সূত্র ধরে । আর লেখক তাঁর কলমের আঁচড়ে তুলে আনতে থাকেন হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের এক বহুমাত্রিক ইতিহাস। অন্যবার হারুন অষ্টমীর দিন নীলুদের বাড়িতে আসে কিন্তু এবারে সে আসেনি। গত বছর হারুন নীলুকে বলেছিল - 'কায়েদে আজম কইছে, এইসব আমরাই পামু।... আমরা মানে মোছলমানেরা।'[৭] কিশোরমনেও প্রভাব ফেলেছে দ্বিজাতি তত্ত্ব । সাম্প্রদায়িকতা বিদ্ধ করেছে বন্ধুত্বকে । আখ্যানের শেষে স্বাধীনতা সংগ্রামী বিশুমামার মুখে আমরা শুনি -'... এরই জন্য কি এতদিন ধরে লড়লাম আমরা ? ভাঙা দেশের জন্য ? এই দেশভাঙার জন্য?'[৮] যে স্বপ্নও আশা নিয়ে স্বাধীনতার লড়াই শুরু হয়েছিল সেই স্বপ্ন ও আশা কোনোদিন পূরণ হয়নি। গাছের মতো মানুষেরও শিকড় থাকে। নীলুর দাদু যখন নিজের হাতে লাগানো সুপুরিগাছের সারির কথা বলতে থাকেন, আমরা বুঝতে পারি ছেড়ে আসা যায়না কোথাও। ফুলমামির নিরুদ্দেশ সংবাদ প্রতীকী হয়ে ওঠে। লক্ষীর পায়ের ছাপ ধরে ফুলমামি ফিরে আসবে ঘরে, নীলুর এই ভাবনা পুনর্নির্মিত করে দেয় লোকবিশ্বাসকে। আম্রপল্লব বসানো সিঁদুরমাখানো ঘটের কাছে বিদায় চেয়ে টলটলে জলে নিজের মুখের ছায়া দেখে 'আবার আসব'

বলতে গিয়ে নীলুর গলা যায় আটকে। কেননা সেটা যে সত্যি নয়। চোখের সামনে থেকে সরে যেতে থাকে কাছারিঘর, মণ্ডপ, দালানঘর। নীলুর সমস্তকিছুকে প্রণাম করতে ইচ্ছে করে। –'প্রণাম তোমায় শেষ। প্রণাম তোমায়, এই দ্বাদশীর বিকেল। প্রণাম ওই খালের মুখে নদীর জলের ঢেউ। প্রণাম তোমায় তুলসীতলা, মঠ। প্রণাম ফুলমামি। প্রণাম তবে তোমায় সুপুরিবনের সারি।'[৯] সবশেষে পাঠকের মন উত্তর খোঁজে নীলুর দাদুর প্রশ্নের- 'অদ্ভুতকথা। নিজের দেশটা কি রাতারাতি অন্যের দেশ হয়ে যায় নাকি? হতে পারে কখনো?'[১০] যে প্রশ্নের উত্তর বাঙালি আজও পায়নি।

'শহরপথের ধুলো' উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে দেশভাগ পরবর্তী কলকাতা শহরের কথা। নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে অচেনা শহর কলকাতায় এসে উঠেছে নীলু। ভর্তি হয়েছে রামকৃষ্ণ মিশনের স্টুডেন্টস হোমে। কলকাতায় এসেই একের পর এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার সাক্ষী হতে থাকে সে। শহরের পথে পথে আর অলিতে গলিতে একটু একটু করে সে দেখে নেয় নতুন মানুষজন । তার চোখের সামনে খুলে যায় শিল্প , সংস্কৃতি, রাজনীতির নতুন জগৎ। একটু একটু করে কৈশোর থেকে যৌবনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে নীলু । উপন্যাসে ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও উঠে এসেছে দেশভাগ পরবর্তী উদ্বাস্তু সমস্যার কথা। নীলুর বয়সী একটি ছেলে সিঙাড়া চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লে দোকানের মালিক বলেছে –'ওঃ এই রিফিউজিগুলোকে নিয়ে আর পারা যায় না মশাই। দেশটাকে দিল একেবারে শেষ করে।'[১১] পূর্ব বাংলা থেকে আগত অসহায় বাস্তুহারা মানুষদের প্রতি এই বিদ্বেষ অনেকেরই ছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের স্টুডেন্টস হোমে দৈনন্দিন জীবন , ক্লাস পালিয়ে যোগেনের সঙ্গে সিনেমা দেখা , পঙ্কজ মল্লিক, দেবব্রত বিশ্বাসের গান শোনা , বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার উদ্যোগ , গান্ধীজীর মৃত্যু , সুকান্ত -সুভাষের কবিতা, বামপন্থী রাজনীতির প্রসঙ্গ ছুঁয়ে এই উপন্যাস দেশভাগ পরবর্তী সময়কে নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করে। ভারতের স্বাধীনতা যে খণ্ডিত স্বাধীনতা উদ্বাস্তুদের থেকে আর কে ভালো বুঝবে।নীলুর মনে হয় –'এই কটা মাস আগেও যেসব স্বপ্ন তারা দেখত, ফলেছে কি তা জীবনে? অনেকসময় তো দেখি উলটো কান্ড! তা নইলে, স্বাধীনদেশের পুলিশ স্বাধীনদেশের মানুষের বুকে নির্বিচারে গুলি চালায় কেন?'[১২] বামপন্থী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে গ্রেপ্তার হয় নীলুর চিমনি কাকু। এসব দেখেশুনে পরীক্ষার হলে বসে প্রশ্নপত্র সামনে রেখে নীলুর মনে হয় যে পরীক্ষা দেওয়া অর্থহীন। যার সঙ্গে তার মনের যোগ নেই তা সে লিখছে কেন? পমির সঙ্গে তার সম্পর্কেও তৈরী হয় অনিশ্চয়তা। এই পরিস্থিতিতে আরও একবার দেশের কথা মনে হয় নীলুর- 'আঃ, যদি ফিরে যাওয়া যেত! যাওয়া কি যায় না আর? নানা, পিছন দিকে যাওয়া কি আর সম্ভব?'[১৩] এই টান আসলে শিকড়ের টান, যে টান কোনোদিন বিচ্ছিন্ন হবার নয়।

দেশভাগের গল্প, দেশত্যাগের গল্প এসে পৌঁছয় নতুনদেশে অস্তিত্বের সংগ্রামে। শঙ্খ ঘোষ নীলুর মধ্য দিয়ে একটা যাত্রাকে ধরতে চান। 'সকালবেলার আলো', 'সুপুরিবনের সারি', হয়ে 'শহরপথের ধুলো' এক সমগ্রের ধারণা তুলে ধরতে চায়। যে সমগ্র খন্ডে খন্ডে লিখে রাখে ইতিহাসের ট্রাজেডি আর মানবতার পরাজয়কে। নীলুর এক

সন্ধেবেলায় শহরপথের ধুলোকে একলা বুকে তুলে নেবার মধ্যে বাঁচার যে আকুতি থাকে, কোনো দেশভাগ তাকে হারিয়ে দিতে পারে না। এখানেই এই ত্রয়ী উপন্যাসের মূলশক্তি। নীলুর লেখা তাই ফুরোয় না। চলতেই থাকে...

তথ্যসূত্র:

১.ঘোষ, শঙ্খ, সকালবেলারআলো,অরুণাপ্রকাশনী, কলকাতা-৬, পঞ্চমমুদ্রণ,মাঘ১৪২৪,পৃষ্ঠা-৩২
২.তদেব, পৃষ্ঠা -৩৩
৩. তদেব, পৃষ্ঠা -৩৩
৪.তদেব, পৃষ্ঠা -২৮
৫.তদেব, পৃষ্ঠা -৭৯
৬.ঘোষ, শঙ্খ,সুপুরিবনেরসারি, অরুণাপ্রকাশনী, কলকাতা -৬,চতুর্থমুদ্রণ, অগ্রহায়ণ -১৪১৯,পৃষ্ঠা -১২
৭.তদেব, পৃষ্ঠা -৫৬
৮.তদেব, পৃষ্ঠা -৮৭
৯. তদেব, পৃষ্ঠা -৯২
১০. তদেব, পৃষ্ঠা -৬৯
১১.ঘোষ, শঙ্খ, শহরপথেরধুলো,অরুণাপ্রকাশনী, কলকাতা -৬, প্রথমপ্রকাশ, মাঘ১৪১৬,পৃষ্ঠা -২১
১২.তদেব, পৃষ্ঠা -৭৭
১৩. তদেব, পৃষ্ঠা -৯৫